Vol. 40 | No. 3 | 1997

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

ফেরদৌসীর শাহনামা : কাব্যিক বিশ্লেষণ

Volume	40
Issue	3
Year	1997
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোঃ মাহ্ফুজুল ইসলাম
Published online	February 1, 1997
DOI	10.62328/sp.v40i3.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v40i3.6
Pages	107-120
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

ফেরদৌসীর শাহনামা : কাবি[illegible]

মোঃ মাহ্‌ফুজুল ইসলাম

ফেরদৌসীর প্রকৃত নাম আবুল কাশেম হাসান ইবনে আলী। তিনি ৯২০ খ্রী: তুস নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তুসের দিহ্‌কান বা জমিদার ছিলেন বলে বিলাসী জীবন যাপন করতেন। তাঁর প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে আবিদ হাসান ফরিদীর গ্রন্থ হতে এই তথ্য জানা যায় যে, তাঁ একটি মাত্র কন্যা ছিল। ইরানের বিশালাকার পৌরানিক ইতিহাস লেখার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তিনি সেখান থেকে অর্জিত অর্থ দিয়ে তাঁর কন্যার যৌতুক দিতে ইচ্ছা করেছিলেন।[১]

ফেরদৌসী অন্যান্য কবিতা রচনা করলেও মূলত শাহনামার জন্যই কবি হিসেবে তাঁর খ্যাতি বিরাজমান। শাহনামাতে যে সমস্ত পৌরানিক উপাখ্যান ও কাল্পনিক কাহিনী অন্তর্ভুক্ত তা ফেরদৌসীর নিজস্ব নয়। ফেরদৌসী নিজেই বলেছেন যে, তুস নগরের কবি দাকিকী এ কাব্য আরম্ভ করেছিলেন। প্রতিভাবান এই যুবক সামানী রাজদরবারের স্তুতিকার ছিলেন। ৯৮০ খ্রী: তাঁর তুর্কী দাস দ্বারা নিহত হলে কাব্যটি মৌলিক কাঠামোতে থেকে যায়।[২] কাব্যটি তখন এক হাজার চরনের সমন্বয়ে গঠিত ছিল। যাতে জরাস্তুর এর উত্থান এবং তাঁর ধর্মের প্রতিষ্ঠা স্থান করে নিয়েছিল। ফেরদৌসী এই স্তবকগুলো নিজ কাব্যের মধ্যে স্থান দেন। ফলে গোটা শাহনামা কাব্যে এটা অত্যন্ত ক্ষুদ্র পরিসারে স্থান পায়।

ফেরদৌসী তাঁর মহাকাব্যের উদ্দেশ্যে যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন তা যথেষ্ট পরিমাণে উচ্চাভিলাষী। গীতি কাব্যের আকারে তিনি তাঁর জন্মভূমির ইতিহাস রচনায় বিশ্বসৃষ্টি বা হযরত আদমের (আঃ) জন্ম হতে আরম্ভ করে ৬০ হাজার মোতাকারীর (দুই লাইনের শ্লোকে) যুগ যুগান্তরের পৌরাণিক, ও কাল্পনিক বীরদের বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে বর্ণনা করে শেষ দিকে ইয়াজদিজার্দ তথা সাসানীয় রাজবংশের সর্বশেষ সম্রাটের পতন পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।[৩] তিনি মধ্যযুগীয় ফার্সী বা পাহলভী ভাষার মাধ্যমে রুস্তম ও ইস্‌ফানদিয়ার, জিউ, সোহরাব, বিহজান ও ফরিদুন ও তাঁদের রাজদুহিতাগণ, দৈত্য, দানব, কাল্পনিক জীবজন্তু ইত্যাদি বর্ণনা করেছেন। এ কথা সত্য যে, এ বিষয়বস্তু প্রাচীনকাল হতেই পারস্যের গণমানুষের চিন্তাধারায় স্থান করে নিয়েছিল। ফেরদৌসীর কৃতিত্ব এই যে, তিনি তাঁর অদ্ভুত কল্পনা শক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন ঘটনার

বিশ্বাসযোগ্য বিশ্লেষণীয় বর্ণনা, যুদ্ধ ও বিজয়োল্লাসজনিত ভোজ উৎসবের জীবন্ত বর্ণনা এবং সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে দীর্ঘ সংলাপ ব্যবহার ও তাদের মধ্যে অসংখ্য চিঠিপত্রের আদান প্রদানের অভিনব পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রাচীন পারসীয় ও সাসানীয় উপাখ্যানকে জীবন্ত করে তুলেছিলেন।[৪]

মহাকাব্যের মূল লক্ষ্য হল Sublime-এর রস সঞ্চার। অর্ধেক ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে দেশ মাহাত্ম্য বা ব্যক্তিগরিমার অভ্রভেদী মিনার গড়ে তুলতে পারে যে কবি-কল্পনা, কিছু অলৌকিকের সংযোগে, বর্ণনার গাম্ভীর্যে, বাচনভঙ্গির ব্যাপকতায় একের কাহিনীকে বহুর বিমূঢ় জিজ্ঞাসায় রূপান্তরিত করতে পারে যে কবি শক্তি তাকেই মহাকাব্যিক কবি কল্পনা এবং মহাকাব্যিক সৃষ্টি ক্ষমতা বলে অভিহিত করা হয়।[৫] ফেরদৌসীর এই কল্পনা শক্তি ছিল।

ফেরদৌসীর শাহনামা নিঃসন্দেহে বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে একটি অতুলনীয় কাব্যের দাবী করতে পারে। এসত্ত্বেও কিছু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমালোচকদের হাতে এর অবমূল্যায়ন করা হয়েছে। সমালোচকরা কিছু সংখ্যক আদর্শের ভিত্তিতে শাহনামার কঠোর সমালোচনা করেছেন। তাঁদের মতে, আধুনিক মানদন্ডে এবং পাশ্চাত্য রুচিধর্মীতায় শাহনামা অথবা যে কোন মহাকাব্য বা সাগা উপভোগে মৌল বাধা হল এদের বিষয়বস্তুর এবং ভাষার গতানুগতিক পদ্ধতি, ঘন ঘন পুনরাবৃত্তি এবং চরিত্রের সাধারণ প্রকৃতি। শাহনামার দ্বিতীয় ত্রুটি হল-এর অতিশয়োক্তি, সুদূর হতে সরবরাহকৃত উপমা অলঙ্কার এবং বাগ্মীতাধর্মী চাকচিক্য। শাহনামার বীরদের জাঁকজমক ও ঐশ্বর্যের আবহাওয়া সৃষ্টি করতে কবি এ সব উপাদানের অবতারণা করেছিলেন যা প্রায়ই প্রথাগত প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত। এই বর্ণনায় লক্ষণীয় যে তাঁর সৈন্যবাহিনী এত বিশাল ছিল যে, এর ভিতর দিয়ে বায়ু প্রবেশ করতে পারত না। যুদ্ধ মাঠের ধূলা, বালি, সূর্যকে আচ্ছাদিত করে দিনকে রাত্রে পরিণত করত এবং অস্ত্রসজ্জিত বাহিনীর পদভারে পাহাড় সমতল ভূমিতে পরিণত হত।

তৃতীয়ত: M.A. Furughi নামক জনৈক আধুনিক ফার্সী সাহিত্যিক দেখিয়েছেন যে, শাহনামাতে বিভিন্ন অবস্থায় একই ভাষার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।[৬] ঘটনা বা শব্দ চয়ন কৌশলে সামান্যমাত্র পরিবর্তন করে যুদ্ধ দৃশ্যের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। শাহনামার পূর্বভাগে যে সমস্ত বিষয়বস্তুর বর্ণনা দেয়া হয়েছে তাই শেষ প্রান্তে যেয়ে পূর্ববর্তী ঘটনার প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। আর বীরদের আগমন ও নির্গমনে সামান্যই সংযত আচরণ লক্ষ্য করা গিয়েছে।

চতুর্থত : সুন্নীরা তাঁকে শিয়া ধর্ম মতবাদের প্রতি অনুরাগের জন্য বিশেষত: মহানবীর (দঃ) বংশের দাবীর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য তাঁর সমালোচনা করেছেন। আর তাঁর কাব্যে জরাস্থুর ধর্মের মতাদর্শ ফুটে উঠেছে।

পরিশেষে বিশ্ববিখ্যাত সুফী কবি মৌলভী জালাল উদ্দিন রুমী এই মর্মে ফেরদৌসীর সমালোচনা করেছেন যে, তিনি ঐ সমস্ত রূপ কথায় আগ্রহ দেখিয়েছেন যা বাস্তবতার মৌল নির্যাসকে অস্বীকার করে বিষয়বস্তুর নগণ্যতার সাথে একাত্ম ঘোষণা করেছে।[৭]

প্রফেসর এডওয়ার্ড জি. ব্রাউনের মতে, এই বিশালাকার কাব্যের সাহিত্যিক মূল্য নিরূপনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমালোচকরা প্রায় একমত হয়ে এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। কিন্তু তাঁদের এই উৎসাহে তিনি পুরাপুরি অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। তাঁর মতে, শাহনামাকে মুহূর্তের জন্য হলেও আরবী মুয়াল্লাকার সাথে একই স্তরে স্থাপিত করা যায় না। ইসলামী বিশে যদিও শাহনামা সমস্ত মহাকাব্যের নমুনা ও আদর্শ তবু তাঁর কল্পনাশক্তির সৌন্দর্য এবং অনুভূতির কমনীয়তায় একে কখনও পারসিকদের নীতিগর্ভমূলক কাব্য, কাল্পনিক কবিতা ও গীতিধর্মী কবিতার সাথে তুলনা করা যেতে পারে না।[৮] এই সমালোচনা ব্রাউনের মত এমন একজন পন্ডিতের নিকট হতে এসেছে যিনি পাশ্চাত্য জগতের পারসিক সাহিত্যামোদীদের মধ্যে সবচেয়ে যোগ্য ও জ্ঞানী ব্যক্তি। কাজেই তাঁর সমালোচনাকে কোনমতেই খাটো করে দেখা যায় না। তাই পারস্য সাহিত্যের স্বনামধন্য এই পন্ডিতের সমালোচনার জবাব দিতে হলে ব্রাউনের পুরাতন বন্ধু এবং স্তুতিবাদী পারসিক প্রধানমন্ত্রি মীর্যা মোহাম্মদ আলী ফুরুখীর মতামতের অবতারণা করা প্রয়োজন। কারণ সাহিত্যের বিচারে দেশবাসীর মতামত নিঃসন্দেহে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং মূল্যবান বলে বিবেচিত হতে পারে। তিনি ফেরদৌসীর জন্মতিথির সহস্রবার্ষিকী উদযাপনের উদ্দেশ্যে নিজস্ব বক্তব্য রেখেছিলেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর পর্যালোচনাই হবে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা পারস্য সাহিত্যের উৎকৃষ্টতা ও অপকৃষ্টতার বিবেচনায় এ দেশীয় লোকের মতামত নিঃসন্দেহে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রমাণিত হবে। যেমন সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হবে ইংরেজী সাহিত্যে ইংরেজদের পর্যালোচনা। দেশবাসীর এই মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শাহনামা প্রথম হতে আধুনিক কাল পর্যন্ত নিজস্ব শক্তিমত্তায় অপরিবর্তনীয় এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

মিঃ ফুরুখীর মতে, পরিমানগত ও গুণগত ভিত্তিতে ফেরদৌসীর শাহনামা পারসিক সাহিত্য এবং কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এর অনুপমতা এত সর্বজনবিদিত যে, একে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে অন্যতম অবদান হিসেবে বর্ণনা করা যেতে পারে।[৯] তাঁর এই প্রশংসার ক্ষেত্রে তিনি মওলানা জালাল উদ্দিন রুমী, শেখ সাদী এবং কবিরাজ হাফিজের ধ্যান ধারণার অবমূল্যায়ন করতে চান না বরং এক্ষেত্রে তিনি নিরঙ্কুশভাবে ন্যায়বান ও বিশ্বস্ত থেকে তাঁদের ফেরদৌসীর পাশে স্থান দিতে চান এবং পারসিক ভাষা ও সাহিত্যে তাঁদের চারটি স্তম্ভ বলে গ্রহণ করতে সম্মত। এখানে লক্ষণীয় সময়ের

অগ্রাধিকার প্রশ্নে ফেরদৌসী অন্যান্য তিন জনের আগেই সাহিত্য ক্ষেত্রে এসেছিলেন। তাই কমপক্ষে তিনি তাঁদের চেয়ে মেধাভিত্তিক গুণের দিক থেকে অগ্রাধিকার দাবী করতে পারেন। পরবর্তী পর্যায়ে মিঃ ফুরুখী কবি হিসেবে ফেরদৌসীর কৃতিত্ব আলোচনা করেন। প্রথমতঃ ফেরদৌসীর কাছে তাঁদের প্রথম শ্রেষ্ঠ ঋণ এই যে, তিনি সর্বকালের জন্য তাঁদের জাতীয় ইতিহাসকে বিস্মৃতির গহ্বর থেকে উদ্ধার করে সর্বযুগের জন্য সংরক্ষণ করেছেন। তিনি পারস্যের অতীত ও গৌরব মহাত্ম্যের ত্রাণকর্তা। যদি তিনি শাহনামাকে কাব্যাকারে গ্রহণ না করতেন তাহলে পরাক্রমশালী ঘটনার পুঞ্জিভূত স্তূপে বিলুপ্ত হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। আর যদি ধরে নেয়া যায় যে এটি বিস্মৃতির তলে হারিয়ে যায়নি বরং বিশাল ঐতিহাসিক গ্রন্থে পুনর্জীবন লাভ করেছে। সেক্ষেত্রে এর ফল হত এই যে, এক লক্ষ লোকের মধ্যে একজনও এটি পাঠ করত না অথবা নিজস্ব চোখে দেখত না। আর এ শ্রেণীর গ্রন্থ কখনও পারসিক মানসিক অনুভূতির উপর এত গভীর এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রভাব বিস্তার করতে পারত না যেভাবে ফেরদৌসীর শাহনামার মাধ্যমে ঘটেছে।

ফুরুখীর মতে, ফেরদৌসীর শাহনামার নিকট পারসিকদের দ্বিতীয় ঋণ হল, শাহনামা ফার্সী ভাষাকে বিস্মৃতি হতে উদ্ধার করে সর্বকালের জন্য তাকে সংরক্ষণ করেছে। পারসিক সাহিত্যামোদী ও কলা শিল্পীদের কাছে ছন্দ ও তাল জ্ঞান ছাড়া ভাষা কোন কৃতিত্বের দাবী করতে পারে না। এই কারণেই বোধ হয় ফারসী ভাষায় গদ্য সাহিত্য বিশাল ইমারতধর্মী সাহিত্য সৃষ্টি সংখ্যার দিক দিয়ে অত্যন্ত সীমিত। ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, কাব্য সাহিত্যেই ফার্সী ভাষা জীবন্ত রূপলাভ করেছে। কাব্য সাহিত্যে কাব্য বলতে কেবলমাত্র সাজসজ্জা ও জাঁকজমকতাকে নির্দেশ করে না বরং কাব্য সাহিত্য সাধারণ মানুষের বোধগম্য হতে হবে এবং এর মধ্যে এমন সব বিষয়বস্তু থাকবে বা জনগণকে আন্দোলিত করতে পারে। ফুরুখীর মতে, শেখ সাদী ও হাফিজের পূর্বে এমন কবিদের সংখ্যা খুবই নগণ্য যাঁদের কাব্য ফেরদৌসীর মত জনগণের চিন্তা শক্তিকে দোলা দিয়েছিল। তাই শাহনামার বিশাল আয়তন এই শ্রেণীর কৃতিত্বের উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখতে সমর্থ হয়েছে।

শাহনামার শ্রেষ্ঠত্বের ক্ষেত্রে ফুরুখীর তৃতীয় যুক্তি এই যে, যে সময় শাহনামা পাঠে ব্যয়িত হয় তা কখনও নষ্ট হয় না, কারণ শাহনামা পারসিকদের জীবনের অংশ বিশেষ। এ কথা সত্য যে যাঁরা শাহনামা পড়েন তাঁদের কাছে দেশাত্মবোধ, রাজনৈতিকতা ও দেশের প্রতি আনুগত্য মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এর ভাষা [illegible]

এবং অলঙ্কার বিবর্জিত। এতে কোন দুর্বল পংক্তির অস্তিত্ব নেই। প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত শাহনামার শিল্পরীতি সুসংহত ও সুসংবদ্ধ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ।

শাহনামার অতুলনীয়তার ক্ষেত্রে ফুরুখীর চতুর্থ যুক্তি অতি সূক্ষ্ম। নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্বে ফেরদৌসী একজন পারসিক। পারসিক বলতে যা কিছু বুঝায় তার সবকিছুই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবমূর্তি। ফেরদৌসী পারসিক জাতির যাবতীয় বৈশিষ্ট্যের প্রত্যক্ষ পরিচায়ক। তাঁর আবেগ, তাঁর চরিত্র, তাঁর বিশ্বাস, তাঁর অনুভূতি ইত্যাদি যা কিছু তাঁর কাব্য শক্তিতে যথার্থভাবে ধরা দিয়েছে তার সবই পারসিক জাতির আবেগের মূল্যায়ন করে। পারসিক জাতির প্রতিবিম্ব হিসেবে বিকশিত হয়েছে। স্বয়ংসম্পূর্ণ আদর্শের ওপরে দাঁড়িয়েও তাঁর আদর্শ ব্যক্তিকেন্দ্রিক সংকীর্ণ মননশীলতা অথবা আত্মম্ভরিতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল না। বস্তুতঃপক্ষে তিনি সমগ্র মানব জাতিকে পুরাপুরিভাবে ভালবেসেছিলেন।

বলা হয়ে থাকে ফেরদৌসীর কাব্যে জরাস্থুর মতবাদের প্রাধান্য লক্ষণীয়। শিয়া মতবাদ অথবা জরাস্থুর মতবাদের সাথে তিনি আত্মিক সম্পর্কে জড়িত ছিলেন না। তিনি দৃঢ়ভাবে এ ঐতিহ্যবাহী মতবাদের প্রতি বিশ্বাস রাখতেন যে, রাষ্ট্র এবং ধর্ম একে অন্যের সমর্থনের প্রয়োজন বোধ করে থাকে। ধর্ম বিশ্বাসে তিনি কখনও উগ্র পন্থী ছিলেন না। এছাড়া তাঁকে বিশ্বের অন্যতম মানবতাবাদী বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে।[১০]

শাহনামার অতিশয়োক্তি, পুনরাবৃত্তি ইত্যাদি সম্পর্কে সমালোচনার কোন যুক্তি থাকতে পারে না কারণ শাহনামার মত এত বড় কাব্য রচনায় বিভিন্ন অনুষঙ্গ এমনভাবে জড়িত যা এই কাব্যের আঙ্গিক কাঠামো রূপায়নে অপরিহার্যরূপেই অন্তর্ভুক্ত। শাহনামার বিষয়বস্তু ও ভাষাশৈলীর গতানুগতিকতা পুনরাবৃত্তি মোটেই দোষণীয় নয় এ জন্য যে এ সব উপাদান সাগা বা মহাকাব্যের উপাদানের প্রয়োজনীয় উপাদান হিসাবে গৃহীত।[১১] বিপরীতপক্ষে শাহনামার অন্যতম কৃতিত্ব হল এই যে, ফেরদৌসীর যুগে সুফী মরমীবাদের প্রভাব বহুল পরিমাণে প্রসারিত হতে থাকে, অথচ শাহনামার শব্দ, শৈলী ও ভাষা অতীন্দ্রিয় অস্পষ্টতা হতে মুক্ত ছিল, যে অস্পষ্টতা ও দুর্বোধ্যতার অন্তরালে ফেরদৌসীর পরবর্তীযুগের ভাষার সৌন্দর্য আবৃত হয়ে পড়ে।

ফেরদৌসীকে "মহাকাব্যের শীর্ষস্থানীয় কবি" বলে যুক্তিসঙ্গতভাবেই গণ্য করা যেতে পারে এবং মহাকাব্যের মন্ডলে এখনও তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী কবি প্রতিভা হিসেবে গৃহীত।[১২] কাব্য জগতে তাঁর শাহনামা অবিস্মরণীয় কৃতিত্বের অনুপম প্রসাদ রূপে এত বেশি পরিমাণে পরিগণিত যে আল্লামা ইবনে আসির শাহনামাকে "আজমী বিশ্বের কোরান" বলে অভিহিত করেছেন। স্যার গোর ওসলী [illegible]

তথ্য সঙ্কেত :

১। Abid Hasan Faridi, An Outline History of Persian literature, Ram Prasad & Brothers, Agra, 1928, p. 62

২। Reuben Levy, An Introduction to Persian Literature, Columbia University Press, New York and London 1969, p. 64-65.

৩। A.J. Arberry, Classical Persian Literature, George Allen & Unwin Ltd, London, 1958, P. 44

৪। প্রাগুক্ত, P. 77

৫। ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত মধুসূদন রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ১৯৮৫, পৃ-৩৬

৬। M.A. Furughi উদ্ধৃতি Reuben Levy, প্রাগুক্ত, P. 78

৭। প্রাগুক্ত, P. 78

৮। Edward G. Browne, A Literary History of Persia, Vol II, Cambridge University Press, 1969, P. 142

৯। Edward G. Browne এর কাছে পাঠানো তাঁর বন্ধু M.A. Furughiর পত্রের উদ্ধৃতি, A.J. Arberry, প্রাগুক্ত, P. 46

১০। Reuben Levy, প্রাগুক্ত, P. 77

১১। Reuben Levy, প্রাগুক্ত, P. 78

১২। Abid Hasan Faridi, প্রাগুক্ত, p. 66

১৩। Abid Hasan Faridi, প্রাগুক্ত, উদ্ধৃতি P. 66

১৪। A.M.A. Shushtery, Outlines of Islamic Culture, Vol-1, The Bangalore Press, Bangalare city, 1938, P. 141

ইমরুউল কায়স-এর গীতিকাব্যে প্রকৃতি

এ,বি,এম, ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী

ইমরুউল কায়স প্রাক ইসলামী যুগের খ্যাতিমান আরব কবি। তাঁর রচিত "মু'আল্লাকাহ"[১] (ঝুলন্ত গীতিকাব্য) অন্যান্য মু'আল্লাকাহগুলোর মধ্যে সর্বাধিক প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। "আস্‌সাব্‌উ'ল মু'আল্লাকাত" (ঝুলন্ত গীতিকা সপ্তক) শীর্ষক সংকলনে এ গ্রন্থকে প্রথম স্থান দেওয়া হয়েছে। কবি কায়স-এর মু'আল্লাকায় প্রেম-বিরহ এবং যুদ্ধের কথা তো আছেই, তবে যে দিক তাঁর 'কাসীদা'[২]-কে বিশিষ্টতা দিয়েছে তা হচ্ছে প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা। সূর্যোদয়ের পূর্বে মরুভূমির গভীর নীরবতা, দু-একটি পাখির কলতান, বালুময় প্রান্তরের উপর ঘোড়া এবং উটের খুরের শব্দ, মরূদ্যানের তরু-পল্লবের শ্যামল-শোভা, এ সবের বর্ণনায় তাঁর মু'আল্লাকা সমৃদ্ধ। এখানে কবি ইমরুউল কায়সের সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য ও তাঁর মু'আল্লাকায় চিত্রিত প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হলো।

সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য

ইমরুউল কায়স নামে খ্যাত প্রাক-ইসলামী যুগের শ্রেষ্ঠ এই আরব কবির নাম আবুল হারিস্ হুন্দুজ ইব্‌ন হুজর আল্‌-কিন্দী, মধ্য আরবের ইয়ামন এলাকার 'কিন্দা' সামন্ত রাজ পরিবারে ৪৮০-৫০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন।[৩] তাঁর দাদার নাম হারিস ইবন আমর। ৫০০ খ্রীস্টাব্দের দিকে হারিস হীরার অধিপতি তৃতীয় মুনযিরকে পরাজিত করে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে মুনযির কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সন্তানেরা ক্ষমতার লড়াইয়ে বিভক্ত হয়ে পড়লে কবির পিতা হুজুর বনু আসাদ গোত্রের নেতৃত্ব লাভ করেন। কবির জননী ছিলেন তাবলিব গোত্রের সুবিখ্যাত সর্দার কুলায়বের ভগ্নী।

কবিতা, গান আর মদ এই নিয়েই ছিল ইমরুউল কায়সের জীবন। (আ,ত,ম, মুছলেহ উদ্দীন ১৯৮২ : ৫১)। শৈশবে কবি অতি আদর যত্নে প্রতিপালিত হলেও যৌবনে পদার্পণ করে কিছু ভবগুরে যুবকের সাহচর্যে উচ্ছৃখল জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। ঘরের চাইতে বাইরের দিকেই তার টান ছিল বেশী। তাই তিনি 'আল মালিক আল-দিল্লীল' বা ভবগুরে যুবরাজ নামে পরিচিত হন। (নিকলসন: ১৯৭৯ :

১০৪)। ফলে পিতা তাঁকে ঘর থেকে বের করে দেন। দুরন্ত কিশোর তাতে বিচলিত না হয়ে নিজেদের যাযাবর গোত্রগুলির মধ্যে মদ, নারী আর কবিতা নিয়ে মত্ত থেকে অবাধ স্বাধীন জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। এক দুরন্ত আবেগ জীবনের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে চলে। এভাবে নাচ-গান ও পানাহারে যখন তিনি মত্ত তখন তাঁর কাছে সংবাদ পৌছায় যে, তাঁর পিতা বনু আসাদ গোত্রের হাতে মর্মান্তিকভাবে নিহত হয়েছেন (গোলাম সামদানী কোরায়শী; ১৯৭৭ : ৯-১০)। সংবাদ শুনে তিনি বলে উঠেন : "পিতা আমাকে ছোট বেলায় তাড়িয়ে দিয়েছেন। আজ এই প্রৌঢ় বয়সে তাঁর মৃত্যুর প্রতিশোধের বোঝা আমার উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। আজ হুঁশ নেই, কাল আর নেশা নয়, আজ মদের পেয়ালা, কাল কাজের কথা"। (ইন্না আল-ক্ষাখুরী-তা-নে : ৮০) এরপর পিতৃহত্যার প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত মাংস ও মদ স্পর্শ করার এবং মাথায় তেল না দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেন (আতম মুছলেহ উদ্দীন; ১৯৮২ : ৫২)।

উদভ্রান্ত যুবক কবি পিতৃ-রক্তের প্রতিশোধ নেবার জন্য পাগল হয়ে উঠেন। তাঁর মাতুল গোত্র বনু বকর ও বনু তাঘলিবের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাঁর উগ্রমূর্তি দেখে বনু আসাদ একশ জন লোককে কবির দাস করে দিতে প্রস্তাব দিলেও যৌবনমদে মত্ত কবি একান্ত অবজ্ঞার সাথে এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। ফলে মাতুল গোত্রগুলির সহায়তা হারান। অন্যদিকে তাঁর পুরনো শত্রু সামন্ত হীরাধিপতি তৃতীয় মুনযির কবির বিরুদ্ধে তৎপর হয়ে উঠেন। তাঁর সঙ্গীরাও একে একে দূরে সরে যায়। নিরুপায় কবি গোত্র থেকে গোত্রে ঘুরে বেড়ান সাহায্যের প্রত্যাশায়। কিন্তু কেউ তাঁকে সাহায্য করতে এমনকি আশ্রয় দিতেও রাজি হয়নি (গোলাম সামদানী কারায়শী; ১৯৭৭ : ১০)।

ফলে কবি নিরাশ হয়ে সমওয়াল ইবন 'আদিয়ার কাছে তাঁর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত লৌহবর্ম গচ্ছিত রেখে রোমান সম্রাট জাস্টিনিয়ানের আমন্ত্রণক্রমে কনস্টান্টিনোপলের পথে যাত্রা করেন। সম্রাট তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন। এখানে তাঁর প্রায় দশ বছর কাটে। সম্রাটের ইচ্ছা ছিল কবির প্রতিশোধ স্পৃহাকে সাম্রাজ্য বিস্তারের কাজে লাগানো। কিন্তু কবির এক শত্রু তিমাহ্ আসদী সম্রাট কন্যার সাথে 'কবি প্রেমে জড়িয়ে পড়েছেন' মর্মে অভিযোগ করলে সম্রাট কবির প্রতি সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েন। কবির সঙ্গে একদল সৈন্য প্রেরণ করে ও অর্ধেক পথ থেকে তা ফিরিয়ে নেন। এই সময় কবি এক অজ্ঞাত রোগে আক্রান্ত হন। তাঁর সমস্ত শরীর দগদগে ঘায়ে ভরে যায়। অনেকের মতে এই রোগ সম্রাট কন্যার সাথে সম্পর্কের জন্য সম্রাট জাস্টিনিয়ানের দেয় বর্মের বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া। এই কারণে তিনি 'যুল কুরুহ'

(ক্ষতযুক্ত ব্যক্তি) উপাধিতেও ভূষিত হন। রোগাক্রান্ত আরবী কবিকুল সম্রাট অকালে আংকারায় ৫৪০ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন (গোলাম আমদানী কোরায়শী; ১৯৭৭ : ১০)।

কবি ইমরুউল কায়স-এর কাব্যকর্মের অনেকাংশই অবলুপ্ত। অবশিষ্টাংশ একটি ছোট দীওয়ানে (সংকলন) সন্নিবেশিত। এ সংকলনটি প্রাচ্যবিদ De Slane-এর তত্ত্বাবধানে প্রথমবারের মত ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দে প্যারিসে মুদ্রিত হয়। পরে আল-বাতলি উৎসী ১৮৯০ সালে এবং জনৈক আবু বকর ইবন আসিম ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে এটিকে বিশেষণসহ মুদ্রণ করেন। ১৯৩০ খ্রী. হাসান আল সান্দরী কর্তৃক টীকা টিপ্পনীসহ মিশর হতে সুবিন্যস্তভাবে মুদ্রিত হয়। পরবর্তীতে ল্যাটিন ও জার্মান ভাষায় এটি অনূদিত হয়। উক্ত সংকলনের অন্যতম প্রধান অংশ ৮০ শ্লোক বিশিষ্ট আলোচ্য মু'আল্লাকাটি ফরাসি ল্যাটিন ও রুশ ভাষায় অনূদিত হয়েছে (হান্না আল ফাৰুরী-তানে : ৮১, ৮২)।

রচনার পটভূমি

কবি ভবঘুরে প্রকৃতির জন্য প্রান্তর থেকে প্রান্তরে সঙ্গী-সাথীদের সাথে ঘুরে বেড়াতেন। তিনি মানুষকে ভালবাসেন। ভালবাসতে চান নারীকে। নারীর মধ্য দিয়ে প্রকৃতির প্রতি কবির ভালবাসা প্রতিফলিত। তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল চাচাত বোন, উনয়যা-র প্রতি কিন্তু তাঁর এ ভালবাসা সার্থক হয়নি বলে মনে হয়। দারাতু'ল জুল্‌জুল্‌ নামক মরূদ্যানে 'উনয়যাকে নিকটে পাওয়ার একটি সুবর্ণ সুযোগ তিনি লাভ করেছিলেন। 'উনয়যা তার সাথীদের সঙ্গে ঐ মরূদ্যানের একটি সরোবরে বিবসনা হয়ে প্রমোদ স্নানে রত ছিল। কবি সরোবরের পাড়ে রাখা নারীদের সব পোশাক নিয়ে যান এবং গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে গোপনে তাদের খেলা দেখতে থাকেন। স্নান শেষে নারীরা কবির কথামত নগ্ন অবস্থায় তাঁর নিকট গিয়ে নিজেদের কাপড় সংগ্রহ করে। কবি তাঁর একমাত্র বাহন উটকে জবাই করে সকলকে এক প্রীতিভোজে আপ্যায়িত করেন। এ ঘটনাই মু'আল্লাকাই রচনার মূল কারণ হিসেবে বিবেচিত (হান্না আল-ফাখুরী, তানে : ৮২)।

কবিতায় প্রকৃতির দৃষ্টান্ত

কবি ইমরুউল কায়স তাঁর 'ঝুলন্ত গীতিকবিতা' রচনা করেছিলেন দারাতু'ল 'জুল্‌জুল্‌' নামক মরূদ্যানের পূর্বে উল্লিখিত সরোবরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে যা তাঁর

প্রকৃতি মনস্কতার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কায়স প্রকৃতিকে আপন করে নিয়ে তার মধ্যে নিরন্তর ঘুরে বেড়াতেন।

নিশীথ রজনীতে আকাশ ব্যাপী তারকারাজি ঝিকমিক করে। এমনি পরিবেশে কবির সপ্তর্ষিমণ্ডল বিষয়ক বর্ণনা প্রকৃতির এক অনুপম নিদর্শন হয়ে ধরা দেয়। মতির মালার সোনা ও মানিককে যেমন প্রোজ্জ্বল মনে হয়, ঠিক তেমনি নক্ষত্ররাজির মাঝে সপ্তর্ষিমণ্ডলকেও উজ্জ্বল মনে হয়। কবির ভাষায় :

নিশীথ রাতে উঠতো সবে সপ্ত ঋষি নভস্তলে,
মানিকখচা মোতির মালার ঝাল্‌'খতে উঠতো জ্বলে।
(নুরুদ্দীন-১৯৭২ : ৭৩)

নৈশকালীন প্রাকৃতিক শোভা উপভোগ করার জন্য কবি জনপদ ভেদ করে অন্ধকারে কিভাবে তাঁর প্রেমিকার সাথে অভিসার করেন তার বর্ণনা দিয়েছেন। কবির ভাষায় :

গৃহসীমা ছাড়ি উপনীতি মোরা খোলা প্রান্তর মাঝে,
বালুকার স্তূপে ভরা মাঠখানি, সেজে অপরূপ সাজে।
(শরফুদ্দীন ১৯৮১ : ৪০০)

নীরব প্রকৃতি হিসেবে খ্যাত 'রাতের বর্ণনা এসেছে ইমরুউল কায়সের গীতিকাব্যে।' কবির কাছে মাঝে মাঝে রাত্রি খুব পীড়াদায়ক মনে হয়। রাত্রির অন্ধকার তাঁকে হতাশ করে তোলে। এ অন্ধকার সতেজতাকে নিঃশেষ করে দেয়। অন্ধকার যেন তাঁর চিন্তাকে আরো ঘনিভূত করে। তিনি আলো চান। সকালের উষা দেখতে চান। পরক্ষণেই হতাশ কবি বলে ওঠেন : "দিনের আলো কি তার দুঃখ ঘুচাতে [illegible]? এখানে উমরুউল কায়স দ্বিধা-দ্বন্দ্বে জড়িত। তাঁর জীবনবোধ [illegible] আধুনিক। তিনি অন্ধকার বা মৃত্যুকে ভয় করেন। কেননা মৃত্যু তাঁকে নিজস্ব অনুভূতি থেকে দূরে কোথায়ও নিয়ে যাবে। তিনি রাতের অন্ধকারকে সমুদ্রের সাথে তুলনা করেন। তাঁর মতে, রাত্রি যেন বার বার তার কালো পর্দাকে প্রসারিত করছে। দীর্ঘ রাতের আকাশের তারকা রাজিও যেন পাহাড়ের সাথে শক্ত রশি দিয়ে বাঁধা রয়েছে। ফলে রাত্রিকে মনে হয় অন্ধ। কবি এ অন্ধকারের আশু অন্তর্ধান কামনা করেন। মূলত কবি রাত্রিকে প্রাকৃতিক দর্শনের সৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। কবির এ দুঃখ বেদনা তাঁর কবিতার মধ্যে বিমূর্ত হয়ে উঠেছে (ইকবাল শাইলো; ১৯৮৮ : ৫৬)। কবির ভাষায়

কতই ভীষণ রাত্রি এল সমুদ্দুরের ঢেউয়ের তালে,
ছড়িয়ে তাহার পর্দা কালো জড়িয়ে দিল বিপজ্জালে।

পরে নিদারুন দীঘল রাতি! আলো এবার উষার আলো,
কিন্তু বল, সেই যে উষা তোমার চেয়ে কিই বা ভালো।
অবাক বটে, রাতের তারা রইল যে হায় ঠাঁয় দাঁড়িয়ে,
পাথর সনে রুদ্ধ যেন রেশমী সুতোর বাঁধন দিয়ে।
(নুরুদ্দীন আহমদ ১৯৭২ : ৮৮)

কাক ডাকা ভোরে প্রাকৃতিক শোভা উপভোগ করার জন্য তেজী ঘোড়ায় চড়ে কবি প্রাতঃকালীন ভ্রমণে বেরুতেন। এখানেই তিনি ক্ষান্ত হননি, পাখিদের নীড় ত্যাগের পূর্বেই এ কাজ সম্পাদন করতেন বলে তিনি চমৎকার এক প্রাকৃতিক দৃশ্য উপস্থাপন করেছেন অনাগত ভবিষ্যতের জন্য। তার বাহন ঘোড়ার গতিকে সুতায় মোড়া লাটাই ও চরকির সাথে তুলনা করে প্রকৃতি চিত্রণের এক নব দিগন্ত উন্মোচন করেছেন। কবি বলেন :

ভোর উষাতে বেরিয়ে পড়ি, বিহগ তখন আপন ঘরে,
হ্রস্বপশম, ক্ষিপ্র-সুঠাম, শিকার ধরা অশ্বে চড়ে।
গতি তাহার শিশুর হাতে সুতায় মোড়া নাটাই যেন,
পলক মাঝে হাতের টানে ঘুরে এল চখী হেন।
(নুরুদ্দীন আহমদ; ১৯৭২ : ৮৯)

গীতিকবিতার শেষাংশে কবি প্রকৃতি-বর্ণনায় প্রতীক হিসেবে বিদ্যুৎকে ব্যবহার করেছেন। বিদ্যুৎ কবির মনে নাড়া দিয়ে অনাগত ভবিষ্যৎকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। আলোর অন্বেষী কবি বিদ্যুতের মধ্যে বৃষ্টির গন্ধ পান। তাই তিনি 'ঘারিয্' ও 'উযায়ব' নামক দু পর্বতের মাঝখানে বসে বিদ্যুৎ চমকানোর দৃশ্য দেখেছেন। বিদ্যুৎ চমকানোর কিছুক্ষণ পর বৃষ্টি নামার নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্যও অবলোকন করে কবি পুলকিত হয়েছেন।

এছাড়া তিনি পাহাড়, পর্বত, গিরি, টিলা, উদ্যান,ছাগল, খেজুর গাছ, প্রথম বর্ষণ, আঁচলযুক্ত চাদর, প্রভাত, বর্ষার পানিতে সাঁতার কাটে মকাকী নামক এক প্রকার পাখি, শরাব, বন পেঁয়াজ প্রভৃতির উল্লেখ করে মোহনীয় এক প্রাকৃতিক পরিবেশের অবতারণা করেছেন। তিনি বিদ্যুতপূর্ণ আকাশকে খালি চোখে দেখতে ভালবাসেন। কেননা বিদ্যুৎ তাঁর কাছে জীবনের স্পন্দন শোনায়। তিনি পাহাড়ের উপর বর্ষণকে চাদর মুড়ি দিয়ে দেখা কোন বিত্তশালী লোকের সাথে তুলনা করে সুন্দর প্রাকৃতিক চিত্রকল্প উপস্থাপন করেছেন। প্রকৃতির সাথে নিবিড় ঘনিষ্ঠতা রচনা করে কবি নিজেকে জীবনঘনিষ্ঠ রোমান্টিক কবি হিসেবে তুলে ধরেছেন। প্রকৃতিই প্রধান উপজীব্য ও বর্ণনা কবির ভাষায় :

বন্ধু সাথে বসনু হেথায়, 'জারিজ উজৈব'[৪] মধ্যিখানে,
দেখতে কেমন রাঙায় আকাশ বিজলি লীলার অগ্নিবাণে।
নামলো অঝোর বর্ষাধারা ডাইনে' কতন'[৫] গিরি চুড়ে,
বামদিকেতে ঝরলো তাহা 'সিতার-জবুল',[৬] পাহাড় জুড়ে।

মুষল ধারায় সেই বরষায় 'কোতায়কাতে'[৭] ঢল নামিল,
বিশাল তরু 'কলাহবিলা'[৮] সেই ঢলেতে উৎখাতিল।
সেই যে বাদল ঝাপটা এসে রাগল 'কানান'[৯] পাহাড় পরে,
খেদিয়ে ছিল বন্য-ছাগল, শূন্য আকাশ রইল পড়ে।
ঐ দেখ না 'তায়্মা',[১০] গাঁয়ের খেজুর কাদির দুর্দশাটাই,
প্রাসাদ ছাড়া পায়নি কিছুই বস্তি-বাড়ি হায়রে রেহাই।
নামলো বাদল তীব্র ধারায় 'সবীর'[১১] গিরিরগাত্র জুড়ে,
বিত্তশালী সাজলো যেন আঁচল ওয়ালা কমলী মুড়ে।
'জুমাই'[১২] টিলার শীর্ষ চূড়ায় জমলো আবর্জনা আসি,
চরখা পরে জড়ায় যেমন পেঁজো তুলোর তন্তুরাশী।
সেই বাদলের বিপুল ধারায় 'গবী',[১৩] মরু উঠলো হাসি,
ইয়েমন দেশের বণিক যেমন প্রসারিল পণ্যরাশি।
সেই বাদলের উৎসবেতে 'জুয়াত'[১৪] বনের মকাক পাখি,[১৫]
মাদক শরাব পান করে বিভোল বিভোর উঠলো ডাকি।
সেই বাদলের কাদায় ঢুবে বন্যপশু সাঁঝের বেলা,
বন পেঁয়াজের শিকড় হেথায় রইল মেলা।
(নুরুদ্দীন আহমদ; ১৯৭২ : ৯২)

সেই চৌদ্দশত বছর আগেকার কবি কায়সের কবিতায় বিধৃত প্রকৃতির বর্ণনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, আজও তা বাস্তব ও যথাযথ। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, প্রতীক ব্যবহার, চিত্রকল্প, ভাষার প্রাঞ্জলতা, শব্দের ব্যবহার প্রভৃতি তাঁকে রোমান্টিক কবিদের পুরোধা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে (ইকবাল শাইলো; ১৯৮৮ : ৫৮)।

টীকা

১ আরবী মু'আল্লাকাহ শব্দটি 'ইলক ধাতু থেকে নির্গত। ইলক অর্থ মূল্যবান বস্তু, প্রতিটি বস্তুতে যা সুন্দর তা; ক্রিয়াপদে এর অর্থ টাঙ্গানো, ঝুলানো;

রূপক অর্থে সেই দামী বস্তু যা পাওয়ার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা হয়, যেহেতু সেটি বিশিষ্ট স্থানে টাঙ্গানো আছে। এ কবিতাগুলো সকলের নিকট সমাদৃত বলে এবং পবিত্র কাবা গৃহে টাঙ্গানো হয়েছিল বলে এগুলোর নাম মু'আল্লাকাহ। কথিত আছে যে, এগুলোকে দামী মিসরীয় বস্ত্রে সোনালী অক্ষরে লিখে কাবা ঘরে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল (আতম মুছলেহ উদ্দীন; ১৯৮২ : ৪৮, ৪৯)।

২ কাসীদা : অর্থ গীতিকবিতা বা দীর্ঘ কবিতা। কাসীদা বা দীর্ঘ কবিতায় সাধারণত পঁচিশ থেকে একশত পর্যন্ত বয়ত বা শ্লোক থাকে। মু'আল্লাকাত দীর্ঘ গীতিকবিতা (আতম মুছলেহ উদ্দীন; ১৯৮২ : ৪৪)।

৩ ইমরুউল কায়সের জন্ম সনের ব্যাপরে মতভেদ রয়েছে : হান্না আল্ ফাখুরী তাঁর 'ত্যারীখু'ল আদবি'ল আরবী' গ্রন্থে ৫০০ খ্রীস্টাব্দে বলে উল্লেখ করেছেন। আর নুরুদ্দীন আহমদ তাঁর আস্-সব্উল্ মুআল্লাকাত গ্রন্থে ৪৮০ খ্রীস্টাব্দে বলে মত দিয়েছেন।

৪ ধারিয় উজৈব : দুটো পর্বতের নাম। কবি এখানকার উপত্যকায় শিকারে গিয়েছিলেন।

৫ 'কতন' : এক পাহাড়ের নাম।

৬ সিতার-জবুল = সিতার ও ইয়াজবুল : দুটো পাহাড়ের নাম।

৭ কোতায়ফা : একটি মৌজার নাম।

৮ কানাহবাল : বিশাল বন্য তরুর নাম।

৯ কানান : পাহাড়ের নাম।

১০ তায়মা : গ্রামের নাম।

১১ সবীর : পর্বতের নাম।

১২ জুমাই = মুজৈমর : একটি টিলার নাম।

১৩ গবীত : ঘবীত্ব : নজদ দেশের একটি ক্ষুদ্র মরুভূমি।

১৪ জুযাও বনের 'মকাক' পাখি = মকাকী-ডাহুক জাতীয় পাখি; এ পাখি জুয়াও বনে থাকে। এ পাখি বর্ষার জলে সাঁতার কাটে ও আনন্দ করে।

গ্রন্থপঞ্জি

ক) Nicolson, *A Literary History of the Arabs*, 1979, Cambridge, London. আতম মুছলেহ উদ্দীন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, ঢাকা। ১৯৮২

খ) নুরুদ্দীন আহমদ, *আস্‌সব্‌উল্‌ মুআল্লাকাত*, বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা। ১৯৭২

গ) সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, *আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ঢাকা। ১৯৭৫

ঘ) শরফুদ্দীন, *আরবী ভাষা ও সাহিত্য*, ঢাকা। ১৯৮১

ঙ) মমতাজ উদ্দীন হাল্লুল উক্‌দাহ মিনা'ল মুল্লাকাহ, ঢাকা।

চ) গোলাম সামদানী কোবায়শী, *আরবী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। ১৯৭৭

ছ) হান্না আল ফাখুরী, তারীখুল আদবি'ল আরবী, আল্‌-মাত বা 'আতু'ল বুলসিয়্যাহ, বৈরুত।

জ) ইকবাল শাইলো, সপ্ত ঝুলন্ত গীতিকায় রোমান্টিসিজম, সবুজ পাতা প্রকাশনী, ঢাকা। ১৯৮৮